ঈশ্বর এবং সত্য (God and Truth):

গান্ধীজীর 'ঈশ্বর' সম্পর্কিত দর্শনকে স্বীকৃত দর্শনের মডেলে ফেলা যে কোন দর্শনের ছাত্রের পক্ষেই অত্যন্ত দুরূহ। কারণ দর্শনের কেতাবী কোন শিক্ষা গান্ধীজীর ছিল না। তাঁর কাছে 'সর্বেশ্বরবাদ' এবং ঈশ্বরতত্ত্বের পার্থক্য কোথায় — সেটা জানা অপ্রয়োজনীয়ই ছিল, শুধু তাঁর ঐশ্বরিক বিশ্বাস সম্পর্কে এটুকুই বলা যায়- কম-বেশি ঈশ্বরে তাঁর বিশ্বাস ছিল একজন 'বৈষ্ণব'এর মতো। যে পারিবারিক পরিবেশে তিনি বড় হয়ে উঠেছিলেন তাতে বৈষ্ণব ভাবনায় তিনি ছোট থেকেই দীক্ষিত ছিলেন।

ভারতবর্ষে বৈষ্ণবরা ঈশ্বরবাদী। তাঁরা বেদ এবং উপনিষদের কর্তৃত্বকে শ্রদ্ধা করেন, এর থেকে তাঁরা প্রেরণা লাভ করেন। কিন্তু সাধারণভাবে এঁরা চিন্তার অদ্বৈত ভাবনা ও বিশ্বাস, যা ভারতবর্ষে খুবই প্রবল, তাকে গ্রহণ করেন নি। বিখ্যাত অদ্বৈত বৈদান্তিক শঙ্করাচার্য জোড় দিয়েছেন নির্গুণ ব্রহ্মের সত্যে। তাঁর মতে, এই জগৎ যা বাহ্যিকভাবে সত্য বলে প্রতিভাত হচ্ছে আমাদের কাছে, অধিবিদ্যার দিক থেকে তা মিথ্যা, ব্যক্তির অজ্ঞতা থেকেই এই বাস্তব জগতের উদ্ভব। স্বাভাবিকভাবেই অদ্বৈত বৈদান্তিকরা কখনই জগতের সৃষ্টিকর্তা অথবা ঈশ্বরের প্রয়োজন অনুভব করেননি। যদি সত্য অনিবার্যভাবেই এক হয়, যদি বহুর প্রত্যক্ষ ভ্রমের ও অজ্ঞতার ফলপরিণতি হয়, তবে সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা উভয়ই অসত্য।

অপরদিকে, বৈষ্ণব চিন্তাবিদেরা এই জগতের সত্যতাকে স্বীকার করেছেন। সুতরাং তাঁরা ঈশ্বরকেও বিশ্বাস করেন জগতের সৃষ্টিকর্তা ও রক্ষাকর্তা হিসেবে। আরো একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ে অদ্বৈত বৈদান্তিক এবং বৈষ্ণব চিন্তাবিদ্‌দের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। অদ্বৈত বৈদান্তিক মতে

চরম সত্য হল গুণহীন অনির্দিষ্ট ব্রহ্ম। তাই এই ব্রহ্ম জ্ঞানই মোক্ষ লাভের উপায়। চরম সত্য নির্গুণ ব্রহ্ম হওয়ায় তাঁকে পূজা করা যায় না, কেননা এই নির্গুণ ব্রহ্মের সঙ্গে কোন ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না, যেমন ভক্ত ও ঈশ্বরের মধ্যে পূজার মধ্যে দিয়ে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সুতরাং মুক্তির একমাত্র উপায় হল জ্ঞান মার্গ—এটাই অদ্বৈত বৈদান্তিকদের নির্দেশ।

কিন্তু বৈষ্ণব চিন্তাবিদেরা 'ঈশ্বর'কে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ঈশ্বর বলেই ভাবেন। তাঁদের মতে, আবেগহীন নিস্পৃহ শীতল জ্ঞানমার্গ কখনই ঈশ্বরের সঙ্গে কোন উষ্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না, ফলে তার সঙ্গে ব্যবধান সৃষ্টি হয়। বৈষ্ণব মতে, ঈশ্বরকে অনুভব ও হৃদয়ঙ্গম করাই মোক্ষের উপায় আর তা সম্ভব কেবল ভক্তিমার্গে নিজেকে সম্পূর্ণ ঈশ্বরের কাছে নিবেদনের মাধ্যমে। আর এ কারণেই বৈষ্ণব মত এতো জনপ্রিয় ভারতবর্ষে। এই মতের সহজিয়া পথ সকল মানুষের পক্ষেই অনুসরণ করা সম্ভব।

গান্ধীজীর ঐশ্বরিক দর্শন কঠোরভাবেই আস্তিকতামূলক চরিত্রের। এও সত্য যে একসময় গান্ধীজী কম-বেশি একজন অদ্বৈতীর মতই সত্যের নির্গুণ চরিত্র নিয়ে কথা বলতেন। কিন্তু একথা তিনি বলতেন এই বিশ্বাস থেকে যে, একজন প্রকৃত ঈশ্বর বিশ্বাসীর ঈশ্বরভক্তির কাছে তাত্ত্বিক সগুণ-নির্গুণ বিভাজন অর্থহীন; অপ্রাসঙ্গিক। বস্তুতঃ তিনি অনুভব করতেন ঈশ্বরের প্রয়োজন শুধু যুক্তি অথবা বৌদ্ধিক কৌতূহলের নিবৃত্তির জন্য নয়, বরং আমাদের অন্তরে বিপদে শক্তিলাভের জন্য এবং শোকে সান্ত্বনা লাভের জন্য। এজন্যই তিনি ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় বলেছেন "...He is no God who merely satisfies the intellect, if He ever does God to be God, must rule the heart and transform it."

এ জাতীয় ঐশ্বরিক চিন্তন গান্ধীজীর ভাবনা জগতে এক সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। তাহল, তিনি একদিকে ঈশ্বর এবং অপরদিকে সত্য উভয়কে একে অপরের দ্বারা সনাক্তকরণ করেছেন। কিন্তু তার কাছে সত্য হল এক নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্ব, অথচ ঈশ্বরকে গান্ধীজী একজন ব্যক্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাহলে এদুটি বিষয়কে কিভাবে পরস্পরের দ্বারা সনাক্ত করা যাবে?

এই সমস্যার বিষয়ে গান্ধীজী নিজেও অবগত ছিলেন। তাই 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় তিনি বলছেন, "আমাকে কৈশোরে ঈশ্বরের এক হাজার নাম জপ করতে শেখানো হয়েছিল, যেমন হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে আছে। কিন্তু এই এক হাজার নামেই ঈশ্বরের পরিচয় কোনভাবেই নিঃশেষ হয়ে যায় না। আমরা বিশ্বাস করি, এবং আমিও চিন্তা করি এটা সত্য যে, অসংখ্য জীবের নানা নামের মতো ঈশ্বরেরও নানা নাম আছে। তাই আমরা এও বলি ঈশ্বর নামহীন, ঈশ্বরের নানা আকৃতি আছে, তাই আমরা এও বলি ঈশ্বর আকৃতিহীন, ঈশ্বর নানাভাষায় কথা বলেন আমাদের সঙ্গে। তাই আমরা বলি ঈশ্বর বাক্‌হীন...যদি মানবিক ভাষায় তার পূর্ণ বিবরণ দেওয়া সম্ভব হয়, তবে আমি এই সিদ্ধান্তেই আসবো যে ঈশ্বর হন সত্য।"

গান্ধীজীর এই উক্তি থেকে ঈশ্বরের সত্যতা সম্পর্কিত বিষয়ে তাঁর দুটি মূল্যায়ন পাওয়া যায়। প্রথমতঃ সার্বিক সত্যের অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি ঈশ্বরেরই সন্ধান পেয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বরকে সত্য বলে ব্যাখ্যা করছেন তিনি, কারণ ঈশ্বরই একমাত্র অস্তিত্বশীল তার কাছে। 'সত্য' গান্ধীজীর কাছে ঈশ্বরের গুণ নয়—বরং ঈশ্বরই সত্য। 'সৎ' শব্দ থেকে সত্যের উদ্ভব আবার 'সৎ' শব্দের অর্থ অস্তিত্ব। সেই কারণে তার কাছে কেবল ঈশ্বরই অস্তিত্বশীল বা সত্য।

কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি তাঁর পূর্ব অভিমত 'ঈশ্বরই সত্য' পাল্টে বলছেন - 'সত্যই

ঈশ্বর'। যৌক্তিক দিক থেকে 'সকল মানুষ হয় মরণশীল' সত্য হলেও উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের স্থান পরিবর্তন করে 'সকল মরণশীল হয় মানুষ' সত্য নয়। কিন্তু এই সমস্যা দূর হয় যখন উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের ব্যপ্তি সমান হয়। উদ্দেশ্য ও বিধেয় একে অপরকে তখন চিহ্নিত করে। কিন্তু গান্ধীজীর বক্তব্য আরো গভীরে নিয়ে যায় আমাদের। তাঁর মতে, যুক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে সম্ভাবনার প্রশ্ন তুলতে পারে। কিন্তু যুক্তি সত্যের অস্তিত্বকে বাতিল করতে পারে না। ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, এবং সন্দেহবাদীরাও 'সত্য'কে অস্বীকার করতে পারে না। বস্তুতঃপক্ষে, 'সত্য' একটা সাধারণ মঞ্চ বিশেষ, যেখানে অবস্থান করেন ঈশ্বরবিশ্বাসীদের সঙ্গে ঈশ্বর অবিশ্বাসীরাও।

কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে 'সত্য' বলতে তিনি কি বুঝেছেন? এককথায় বলা যায়, 'বিবেকের নির্দেশ'কেই তিনি সত্য বলে বিশ্বাস করতেন। অনেকেই বলতে পারেন, তাহলে তো বিভিন্ন রকমের সত্য হবে, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে 'সত্য' পরস্পর বিরোধীও হতে পারে?

গান্ধীজী এই প্রসঙ্গে বলছেন, এতে বিচলিত হবার কোন কারণ নেই। যেখানেই শুদ্ধ প্রযত্ন আছে, সেখানেই দেখা যাবে, যা সত্য বলে মনে হচ্ছে, তা একই বৃক্ষের অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন পত্রের মতো। ঈশ্বরের বিভিন্ন নামের মতো সত্য নানাভাবে নানা জনের কাছে প্রকাশিত হয়। তাই যে ব্যক্তি সত্যকে যেমনভাবে দেখে তার তেমনভাবে আচরণ করায় কোন দোষ নেই। যদি তার সত্য দর্শনে কোন ভুল থাকে, তবে সংশোধন নিজের থেকেই হবে। সকলকেই আপেক্ষিক সত্যের উপর নির্ভর করে চরম সত্যের অনুসন্ধানে সচেষ্ট হতে হয়।

তবে গান্ধীজী সত্যানুসন্ধানে সচেষ্ট ব্যক্তিদের সচেতন করে দিয়েছেন এই বলে, 'যার ভিতর যথোচিত বিনয়ের অভাব আছে, তিনি কখনই সত্যের আবিষ্কার করতে পারেন না, সত্য সাগরে সাঁতার কাটতে হলে নিজেকে শূন্যে পরিণত করতে হবে। অর্থাৎ নিজের জ্ঞান-গরিমা ও ক্ষমতার সবরকম অহমিকাকে যিনি ত্যাগ করতে পারবেন, তিনিই সত্য অনুসন্ধানের প্রকৃত অধিকারী।

ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রমাণ (Proofs for the existence of God) :

গান্ধীজীর সমালোচকেরা প্রায়শঃই এমন অভিযোগ করে থাকেন—ঈশ্বরের ধারণা গঠনের ক্ষেত্রে গান্ধীজী 'যুক্তি'কে যথাযোগ্য মর্যাদা দেননি। এ জাতীয় সমালোচনার ভিত্তি হল গান্ধীজী প্রায়ই বলতেন 'অন্তরের কণ্ঠস্বর' অথবা 'বিবেকের কণ্ঠস্বর'। বস্তুতঃ তিনি যুক্তিবুদ্ধিকে সমালোচনা করে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় ১৯২৬ সালে বলছেন, "Rationalists are admirable, beings, but Rationalism can be a hideous monster when it claims omnipotence for itself. Attribution of omnipotence to Reason is as bad a piec · of idolatry as the worship of stick and stone believing it to be God. I plead not for the suppression of reason, but for a due recognition of that in us which sanctifies reason."

এর থেকে এটাই প্রমাণিত যে গান্ধীজী ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বপক্ষে যৌক্তিক ব্যাখ্যাকে চরম গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন না। গান্ধীজীর মনে দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে ঈশ্বরকে জানা যায় কেবলমাত্র আন্তরিক উপলব্ধির দ্বারা। ব্যক্তি এককভাবে ঐশ্বরিক জ্ঞানের অধিকারী হয় আপন হৃদয়ের পবিত্র ও আন্তরিক অভিজ্ঞতার দ্বারা। তবে, তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও, তিনি দার্শনিক ভঙ্গিতেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

দেকার্তের জগত-কারণ বিষয়ক যুক্তির ভঙ্গিতেই তিনি সাজিয়েছেন তার কারণ বিষয়ক যুক্তিকে এইভাবে, "আমরা অস্তিত্বশীল, আমাদের পূর্বপুরুষরাও অস্তিত্বশীল ছিলেন। এবং তাদেরপূর্বপুরুষরাও অস্তিত্বশীল ছিলেন। এভাবে কারণ অনুমানের শেষে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হয় কে শুরু করেছিলেন সমগ্র সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে? কে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির আদি পুরুষ?" গান্ধীজী মনে করেন এভাবে কারণ অনুসন্ধান করতে করতে যৌক্তিকভাবে ঈশ্বরের ধারণায় উপনীত হতেপারেন ব্যক্তি। দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রসঙ্গে কারণ-বিষয়ক তত্ত্বের সঙ্গে গান্ধীজীর এই বক্তব্যের সাদৃশ্য রয়েছে যথেষ্ট।

ঈশ্বরের অস্তিত্বে উদ্দেশ্য বিষয়ক প্রমাণও পাওয়া যায় গান্ধীজীর ভাবনা থেকে। বিভিন্ন সময়ে তিনি জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলা নিয়ে নানা কথা বলেছেন। তিনি এমন কথাও বলেছেন জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করছে এক অমোঘ নিয়ম। এরপর তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, এই নিয়ম ও শৃঙ্খলাকে ব্যাখ্যা করা যায় না—যদি না এক বুদ্ধিদীপ্ত আইন স্থাপনকারীর পূর্বানুমান করি। তিনি বলছেন এ প্রসঙ্গে, 'I subscribe to the belief or the philosophy that all life in its essence is one ... This belief requires a living faith in a living God who is the ultimate arbiter of our fate.'

কিন্তু গান্ধীজীর কাছে 'নৈতিক প্রমাণ' আরো বেশি বিশ্বাসযোগ্য ছিল। বস্তুতঃ তিনি এ জাতীয় প্রমাণকে যথেষ্ট মূল্য দিতেন এবং হামেশাই এর উদাহরণ দিতেন। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল বিবেকের কণ্ঠস্বরই বহন করে আনে ঈশ্বরের অস্তিত্বসূচক শব্দরাশি। বিবেক - তাঁর মতে, প্রতিনিধিত্ব করে মানুষের অন্তর্নিহিত ঐশ্বরিক সত্তার। এটাই তাকে অবগত করে কোনটি ভাল আর কোনটি মন্দ। বিবেক অনুমোদন করে ভালকে, আর তিরস্কৃত করে মন্দকে। বিবেকই আমাদের মনে এক স্বর্গীয় আনন্দের সৃষ্টি করে যখন ভাল কিছু আমরা করি, আবার বিবেকই আমাদের কন্টকবিদ্ধ করে যখন আমরা ভুল পদক্ষেপ নিই। এই অন্তরের কণ্ঠস্বরের বৈশিষ্ট্য হল: যখনই এর নির্দেশ আসে, সেই নির্দেশকে আমরা পাই কর্তৃত্বের সঙ্গে। এই নির্দেশ অবশ্য পালনীয়। একে অবজ্ঞা করার ক্ষমতা আমাদের থাকে না। তাই গান্ধীজী স্পষ্টভাবে বলছেন, 'ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রকাশ আমার কাছে বিশেষভাবে হয় না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তিনি নিজেকে প্রত্যেক মানুষের কাছে প্রতিদিন প্রকাশ করেন। কিন্তু আমরা চোখ বন্ধ করে থাকি।' ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় ১১ অক্টোবর ১৯২৮ সালে এ প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, 'He who would in his own person test the fact of God's presence can do so by a living faith. And since faith itself cannot be proved by extraneous evidence, the safest course is to believe in the moral government of the world and therefore in the supremacy of the moral law, the law of truth and love.'

তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বপক্ষে আরো এক ধরণের প্রমাণে বিশ্বাস করতেন তাহল - 'বাস্তবিক প্রমাণ' (Pragmatic proof)। তাঁর মতে ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রমাণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কারণ ঈশ্বর আমাদের জীবনের অত্যন্ত এক গুরুত্বপূর্ণ দিককে পরিতুষ্ট করেন। যদি আমরা আমাদের জীবন পর্যালোচনা করি, তবে দেখা যাবে দৈনন্দিনের বস্তুগত জৈবিক চাহিদার বাইরে আমাদের মধ্যে এক ভিন্নতর চাহিদা আছে। এই চাহিদা হল আধ্যাত্মিক সন্তুষ্টির। উৎকণ্ঠা ও সংকটের চরম মুহূর্তে এই আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন আমরা অনুভব করি। যুক্তিবুদ্ধির সীমা যখন শেষ হয়ে যায়,

অহিংসা (Non-Violence):

মানুষকে হিংসা বর্জন করতে গান্ধীজীই প্রথম বলেননি। বহু প্রাচীন কাল থেকেই অহিংসার বাণী এদেশে প্রচারিত হয়েছে। আমাদের গৌতম বুদ্ধ, মহাবীর অনেকেই এই অহিংসার বাণী প্রচার করেছেন। গান্ধীজী বলছেন 'এ প্রসঙ্গে আমার জগতকে কোন নতুন কিছু শিক্ষা দেবার নাই। সত্য এবং অহিংসা পাহাড়ের মতই প্রাচীন। আমি যা করেছি, তাহল এ দুটি বিষয় নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, এবং তা করতে গিয়ে কখনও কখনও ভুল করেছি। ঐ ভুল থেকেই আমি শিক্ষা নিয়েছি।'

তাই গান্ধীজীর সমগ্র জীবন দর্শন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, সত্য ও অহিংসা এক অখণ্ড আদর্শে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর চিন্তায়। তিনি এই দুটি বিষয়কে কখনই 'জমজ' বলে মনে করেননি। বরং তার মতে সত্য অহিংসার অন্তরে অবস্থিত। একটিকে অপরটি থেকে কোনভাবেই বিচ্ছিন্ন করা যায় না। এরা একই মুদ্রার দুই দিকের মতো অথবা বলা যায় স্ট্যাম্প ছাড়া ঘষা একটি ধাতুর গোলাকৃতি - যার কোন দিকটি সোজা আর কোন দিকটি উল্টো বলা যায় না। অহিংসা হল উপায়, আর সত্য হল লক্ষ্য। সুতরাং অহিংসাই হল আমাদের চরম কর্তব্য। কর্তব্য যদি আমরা শত বাধা সত্ত্বেও যথাযথভাবে পালন করি, তবে লক্ষ্যে আমরা একদিন পৌছাবো নিশ্চয়ই আগে বা পরে।

প্রথমে আমরা গান্ধীজীর ভাবনায় 'অহিংসা' কিঅর্থে প্রতিফলিত হয়েছে তার আলোচনা করছি, এজন্য নয় যে, গান্ধীজী এই শব্দটিকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন, যে অর্থ প্রথাসিদ্ধ অর্থ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজী গুরুত্ব দিয়েছেন অহিংসার কিছু বিশেষ দিক সম্পর্কে - যে দিকগুলিকে অহিংসার অন্য উপাসকেরা তেমন গুরুত্ব দেননি। ফলে গান্ধী ভাবনায় অহিংসা এক বিশেষ রূপ লাভ করেছে - যেটা তাঁর নিজস্ব বিশিষ্ট ভাবনা।

'অহিংসা' শব্দটির একটি নঞর্থক দিক যেমন আছে, তেমনি আছে একটি সদর্থক দিক। অহিংসার স্বাভাবিক অর্থ 'হত্যা না করা'। আরো বৃহৎ অর্থে বলা যায়, 'অহিংসা' হল কাউকে আঘাত না করা। যে কোনভাবেই হোক 'হিংসা' শব্দটির বিপরীত শব্দ হল 'অহিংসা'। 'হিংসা'র অর্থ যা যন্ত্রণার উদ্রেক ঘটায় অথবা কোন জীবনকে হত্যা করা ক্রোধবশতঃ অথবা স্বার্থপরতা বশতঃ। এই সমস্ত কিছু থেকে বিরত থাকাই অহিংসা। প্রকৃতপক্ষে 'অহিংসা'কে এইভাবে গ্রহণ করার প্রেরণা গান্ধীজী পান জৈনদর্শন থেকে, যেখানে বলা হয়েছে চিন্তায়, বাক্যে এবং ক্রিয়ায় প্রতিনিয়ত অহিংস থাকার কথা) জৈন দর্শনে ব্যক্তি শুধু নিজে 'হিংসা' থেকে বিরত থাকবেন এমন নয়, তিনি কোন হিংসার কারণ হবেন না অথবা 'হিংসা' ঘটার সমর্থনও করবেন না।

তবে জৈন মতের অনুরূপ কঠোর অর্থে গান্ধীজী 'অহিংসা'র নঞর্থক দিকটিকে স্বীকার করেননি। কারণ তিনি জানতেন বাস্তব জীবনে এতো কঠোরভাবে অহিংসা পালন সম্ভব নয়। এও

জানতেন কোন কোন ক্ষেত্রে 'হিংসা'কে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। যেমন, খাদ্যগ্রহণের ক্ষেত্রে, জলপান করার ক্ষেত্রে, হাঁটা-চলার ক্ষেত্রে, শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ প্রভৃতির ক্ষেত্রে অন্যের দেহকে আঘাত না করে নিজের দেহকে রক্ষা করা অসম্ভব। বস্তুতঃ গান্ধীজী প্রকাশ্যেই কিছু কিছু ক্ষেত্রে হত্যাকে অনুমোদন করেছেন। তিনি 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় ১৯২৬ সালের ৪ঠা নভেম্বর লিখছেন, "Taking life may be a duty. We do destroy as much life as we think necessary for sustaining our body. Thus, for food we take life, vegetable and other, and for health we destroy mosquitos and the like by the use of disinfectants etc. and we do not think that we are guilty of irreligion in doing so... for the benefit of the species we kill carnivorous beasts... even man-slaughter may be necessary in certain cases. Suppose a man runs a muck and goes furiously about sword in hand, and killing any one that comes in his way, and no one dares to capture him alive. Anyone who despatches this lunatic, will earn the gratitude of the community and be regarded as a benevolent man."

কিন্তু গান্ধীজী 'অহিংসা' সম্বন্ধে যে সদর্থক ধারণা পোষণ করতেন সেটি আরো গভীরে নিয়ে যায় আমাদের। তাঁর মতে অহিংসা হল মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি। হিংসা দিয়ে কোন কিছুর স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয় ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে। যদি আমরা পৃথিবীতে জীব বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করি, তবে দেখা যাবে, যদিও প্রাথমিক অবস্থায় পশুশক্তিই নিয়ন্ত্রণ করেছে জীবজগৎকে, কিন্তু বিবর্তনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জীব জগতে অহিংসার অগ্রগতি ঘটেছে। বস্তুতঃ জীব জগতের কেউই নিজের প্রজাতিকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করে না বা ধ্বংস করে না।

বস্তুতঃ অহিংসার সদর্থক দিক 'ভালবাসা' ছাড়া আর কিছুই নয়। 'ভালবাসা' হল এমন এক অনুভূতি যা আমাদের সকলকে একসূত্রে গ্রথিত করে। ভালবাসার অনুভূতিতে ব্যক্তি তার ভালবাসার বস্তুর সঙ্গে নিজেকে একাকার করে ফেলে। তাই অহিংসার জন্য প্রয়োজন এমন এক স্বাধীন মানসিকতার যেখানে ক্রোধ, বিদ্বেষ, ঘৃণা, প্রতিশোধ ঈর্ষাপরায়ণতা প্রভৃতি কিছুই থাকবে না। কারণ এগুলিই হল ভালবাসার পথে প্রধান বাধা। প্রাসঙ্গিকভাবে গান্ধীজী বলছেন, 'অহিংসা ভালবাসার এক সদর্থক গুণ যা অন্যায়কারীরও মঙ্গল কামনা করে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে অহিংসা অন্যায়কারীকে তার অন্যায়ের কাজে সাহায্য করবে অথবা নিষ্ক্রিয় ও মৌন সম্মতির দ্বারা তার অন্যায় কাজকে সহ্য করবে। পক্ষান্তরে, ভালবাসা যা অহিংসার সক্রিয় অবস্থা, তা চাইবে যে আপনি অন্যায়কারীর কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করে তার প্রতিরোধ করুন-এই কাজ যদি তাকে অসন্তুষ্ট করে অথবা তাতে যদি তার শরীরে আঘাত লাগে তবু সেই কাজ করতে হবে।'

প্রকৃতপক্ষে, গান্ধীজীর কাছে 'অহিংসা'র মূল্য দুটি। প্রথমটি 'মানবীয় গুণ' ও দ্বিতীয়টি 'সংগ্রাম কৌশল'। মানবীয় গুণ হিসাবে অহিংসার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেছিলেন দুই দিক থেকে — ১) জৈব জীবনের বিকাশ ও ২) মনুষ্যত্বের বিকাশ। সমাজে মানুষ একক নয়, সমাজ না থাকলে মানুষ আপন অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না। সুতরাং সমাজের অস্তিত্ব রক্ষা

করার জন্য পারস্পরিক প্রেম সহযোগিতা ও অহিংসার নীতিকে অনুসরণ করতেই হবে।

সংগ্রাম কৌশল হিসাবে অহিংসা অনেক বেশি কার্যকর। অস্ত্রের সাহায্যে হিংসা দ্বারা সমস্যার সমাধান কোন দেশে, কোন কালেই হয়নি। তাছাড়া হিংসা হল প্রধানতঃ দৈহিক শক্তিমানের হাতিয়ার। অস্ত্রের সাহায্যে হিংসা যে সাফল্য আনে তা নির্ভর করে অস্ত্রের ধ্বংসাত্মক শক্তির পরিমাপের উপর, যারা অস্ত্র প্রয়োগ করবে তাদের দলগত ও সাংগঠনিক শক্তির উপর। শারীরিক শক্তিতে যে মানুষ দুর্বল হিংসা কখনই তার কাছে অন্যায় প্রতিরোধের হাতিয়ার হতেপারে না— যদিও অস্ত্রের সাহায্যে সে সাময়িক শারীরিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে আবার তারঅস্ত্রের সঙ্গে প্রতিপক্ষের অস্ত্রের তুলনামূলক উৎকর্ষতার উপর নির্ভর করবে সফলতা কিম্বা ব্যর্থতা।

তাই সবদিক বিবেচনা করে, সমস্যার মূলে গিয়ে সমাধান করতে হলে অহিংসাই হল শ্রেষ্ঠ কৌশল। এ প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, 'অহিংসা নিষ্ক্রিয় আধ্যাত্মিকতা নয়, যা অলস ধ্যানে নিমগ্ন থাকবে। অহিংসা হল এক সক্রিয় শক্তি যা শত্রুর শিবিরে যুদ্ধকে বহন করে নিয়ে যায়। সর্বপ্রথম শত্রু শিবির হল স্বয়ং। তাই প্রত্যেককে নিজের অন্তরে ক্রমাগত সন্ধানী আলো ফেলতে হবে। ...প্রত্যেককে নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক অস্ত্রের দ্বারা গভর্নমেন্টের, সমাজের এবং দেশের মধ্যে যে অন্যায় রয়েছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। কেননা পাপের সঙ্গে সহযোগিতা কিছুতেই করা যাবে না'।

গান্ধীজী অহিংসাকে সমাজীকরণ করতে চেয়েছিলেন। অহিংসাকে ব্যক্তির স্তর থেকে সমাজের স্তরে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। সমাজের শক্তিরূপে অহিংসার অর্থ হল শোষণহীনতা। এটি কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাকে প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

এই অহিংসা পালনের চরম শর্ত হল গান্ধীজীর কাছে ঈশ্বরের বিশ্বাস। অহিংস আচরণের জন্য প্রয়োজন অন্তরের শক্তি — যার উৎস হতে পারে একমাত্র ঈশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাস। ঈশ্বরের আন্তরিক বিশ্বাসই মানুষকে শিক্ষা দেয় অন্যান্য সকল মানুষকে আপন ভাবতে। এভাবে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসাই - মানুষের প্রতি ভালবাসায় পর্যবসিত হয়।

'সত্যাগ্রহ'—অহিংসার কৌশল (Stayāgraha - The Technique of Ahimsā) :

গান্ধীজীর কাছে 'সত্য' হল ঈশ্বর। এবং 'সত্য' সম্পর্কে 'আগ্রহ'ই 'সত্যাগ্রহ'। সুতরাং সত্যের প্রতি অসীম ভালবাসাই সত্যাগ্রহ আবার সত্য পথ অনুসরণকেও 'সত্যাগ্রহ' বলা যায়। 'হিন্দ স্বরাজ' গ্রন্থে তিনি বলছেন, 'সত্যাগ্রহ হল ব্যক্তিগতভাবে কষ্ট স্বীকার করে অধিকার অর্জন। এটি সশস্ত্র প্রতিরোধের বিপরীত। যে কাজে আমার বিবেকের সায় নেই, আমি যখন তা করতে অস্বীকার করি, আমি আত্মিক বল প্রয়োগ করি।' একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে তিনি স্পষ্ট করেছেন।

'ধরা যাক, সরকার এমন এক নিয়ম করলেন যা আমার বিবেক অনুমোদন করে না। এই অবস্থায় যদি সরকারের বিরুদ্ধে জোর প্রয়োগ করে ঐ আইন আমি রদ করাই তাহলে এতে আমার দৈহিক বল প্রয়োগ করা হল। কিন্তু যদি আমি ঐ আইন স্বীকার না করি, আর সে জন্য নির্দিষ্ট সাজা স্বেচ্ছায় বরণ করি, তবে আমি আত্মিক বল প্রয়োগ করলাম। এর মধ্যে পড়ে আত্মবিসর্জন। প্রত্যেকেই স্বীকার করেন যে, আত্মবিসর্জন অন্যদের বলি দেওয়ার চেয়ে অসীম শ্রেয়। তাছাড়া সত্যাগ্রহ যদি অসঙ্গত কারণে করা হয় তাহলে কেবল সত্যাগ্রহীই দুঃখ ভোগ

করে। তার নিজের ভুলের জন্য সে অপরকে কষ্ট দেয় না। মানুষ এমন অনেক কিছু করে যা পরে ভুল বলে প্রতিপন্ন হয়। কোন মানুষই এমন দাবি করতে পারে না যে, সে সম্পূর্ণ নির্ভুল বা কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয় ভুল বা মন্দ, কারণ সে সেই রকম মনে করে কিন্তু যতক্ষণ কোন কিছু তার সুচিন্তিত বিচারে ভুল বলে মনে হবে তা তার পক্ষে ভুলই। কাজেই যে যা ভুল বা অন্যায় বলে জানে, তার তাই করা উচিত নয় এবং পরিণামে যাইহোক সেই দুর্ভোগ ভোগ করা উচিত। গান্ধীজীর মতে, অন্যায় আইন মানতে হবে, এইরকম ভুল যে পর্যন্ত দূর না হবে, সে পর্যন্ত নিজেদের দাসত্ব কখনো যাবে না। এইরকম ভুল কেবল সত্যাগ্রহীই দূর করতে পারেন। শরীরের শক্তি বা গোলা বারুদ দিয়ে কাজ উদ্ধার করা সত্যাগ্রহীর বিপরীত ব্যবস্থা। শক্তি প্রয়োগের অর্থ এই দাঁড়ায় যে আমরা যা পছন্দ করি, আমার আশপাশে যারা আছে তাদের দিয়ে তাই করিয়ে নিতে চাই। যদি এটাই ঠিক হয়, তাহলে আশপাশের লোকও আমাকে দিতে তারা যা চায় গোলা বারুদের সাহায্যে তাই করিয়ে নেওয়ার অধিকারী। যিনি একথা মানেন যে, নিজের বিবেকের বিরোধী আইন মানতে লোক বাধ্য নয়, তার পক্ষে সত্যাগ্রহী কাজ করাই সবচেয়ে ভাল পথ।

একজন 'সত্যাগ্রহী' নিজেই নিজের অস্ত্র। এই আত্মিক বল তুলনাহীন। এটি দুর্বলের অস্ত্র নয় - সবলের অস্ত্র। কারণ সত্যাগ্রহের জন্য যে সাহস ও পৌরুষের প্রয়োজন, দৈহিক শক্তি প্রয়োগকারীর সেই সাহস নেই। তোপের মুখে শয়ে শয়ে লোককে উড়িয়ে দিতে বেশি সাহসের প্রয়োজন হয় না, বরং তোপের মুখে হাসতে হাসতে মরতে বেশি সাহস প্রয়োজন। যে মরণকে নিজের মাথার ওপর নিয়ে বেড়ায় সেই প্রকৃত বীর, যে অন্যের মৃত্যু নিজের হাতে রাখে তাকে প্রকৃত বীর বলা যায় না। যে কাপুরুষ, যার মনুষ্যত্ব নেই সে এক ঘন্টাও সত্যাগ্রহী থাকতে পারে না। দৈহিকভাবে দুর্বল লোকও যেমন সত্যাগ্রহী হতে পারে, তেমনি স্ত্রীলোকেরাও সত্যাগ্রহী হতে পারে। এর জন্য সৈন্য দলের ট্রেনিং এর দরকার নেই। দরকার কেবল নিজের মনকে বশে আনা, তাহলেই সিংহের মত নির্ভয়ে সে চলাফেরা করতে পারবে।

প্রকৃতপক্ষে, সত্যাগ্রহ এমন তলোয়ার যার সবদিকেই 'ধার'। একে যেভাবে খুশি কাজে লাগানো যায়। সত্যাগ্রহ অস্ত্র যে ব্যবহার করে, আর যার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়,সত্যাগ্রহ দুজনকেই আশীর্ব্বাদ করে। এক ফোঁটা রক্তপাত না করেও সুদূরপ্রসারী ফল পাওয়া যায়। এই অস্ত্রে মরচে পড়ে না, একে কেউ ছিনিয়েও নিতে পারে না। সত্যাগ্রহীদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা কখনো তাদের ক্লান্ত করে না, ক্ষয় করে না। সত্যাগ্রহ তলোয়ারের খাপের প্রয়োজন নেই। সত্যাগ্রহী হওয়া যেমন সহজ, তেমনি কঠিনও। কিশোর বালক যেমন সত্যাগ্রহী হতে পারে, তেমনি দৈহিক দিক থেকে দুর্বল রোগীও সত্যাগ্রহী হতে পারে। আবার বিশাল দৈহিক শক্তির অধিকারী ব্যক্তিও সত্যাগ্রহী হতে পারেনি এমন দেখা যায়।

গান্ধীজীর মতে, একজন সত্যাগ্রহীর চারটি গুণ অবশ্যপালনীয়। তাকে ১) ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে হবে, ২) দারিদ্র গ্রহণ করতে হবে, ৩) ভয়হীন হতে হবে, এবং ৪) সবসময় সত্যপালন করতে হবে।

১) ব্রহ্মচর্য্য পালন : ব্রহ্মচর্য্য এক মহাব্রত। এটা ছাড়া মন দৃঢ় হতে পারে না। ব্রহ্মচর্য্য পালন না করলে মানুষ নির্বীর্য, কাপুরুষ ও দুর্বল হয়ে পড়ে। যার মন জৈবিক কাম রিপুর বশীভূত তার দ্বারা কোন রকমের বড় কাজ হতে পারে না।

২) দারিদ্র গ্রহণ : দারিদ্রব্রত গ্রহণ করাও তেমনি প্রয়োজন। পয়সার লোভ থাকা - আর সত্যাগ্রহী

হওয়া এই দুই কাজ একসঙ্গে চলতে পারে না। এর দ্বারা একথা বলা হচ্ছে না যে যার পয়সা আছে, তাকে তা ছুড়ে ফেলতে হবে। বরং টাকা-পয়সা সম্বন্ধে নির্বিকার হতে হবে। সত্যাগ্রহ ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে তাদের বরং প্রতি পাই পয়সা হারাবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

৩) ভয়হীনতা : নির্ভীকতা ছাড়া সত্যাগ্রহী একপাও চলতে পারে না, তার সবরকম অবস্থাতেও নির্ভয় হওয়া চাই। কঠিন বলে সত্য পালনের ব্রতভঙ্গ করা চলে না। মাথায় যখন বিপদ এসে পড়ে তখন তা সহ্য করার ক্ষমতা মানুষকে ঈশ্বরই দিয়েছেন।

৪) সত্যপালন : সত্যাগ্রহকে গান্ধীজী 'সত্যের বল' বর্ণনা করেছেন। যে কোন মূল্য দিয়েও সত্যানুসরণ প্রয়োজন। প্রাসঙ্গিকভাবে একটি জীবন রক্ষা করার জন্যেও কি মানুষ মিথ্যা বলবে না ইত্যাদি প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু যারা মিথ্যার পক্ষে যুক্তি দিতে চান কেবল তাদের মনে এসব প্রশ্ন জাগে। যারা সবসময় সত্য পথে চলেন, তাঁদের কছে ঐরকম সংকট হাজির হয় না। আর হাজির হলেও সত্যাগ্রহী মিথ্যাচার করার বিপদ থেকে রক্ষা পায়।